বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মূর্তি ভাঙা

সাল সত্তর। সেইসময় আমি জেলে। জেলের ভেতরে বসে বাইরের আন্দোলনের খবর পাই। একদিন শুনলাম হাওড়ায় আমাদের পার্টি, সি. পি. আই. (এম-এল)-র ছেলেরা গান্ধীর মূর্তিতে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। তারপর কলকাতায় এবং অন্যান্য জেলায় একের পর এক মহাপুরুষদের (যাঁদের আমরা তাই জানতাম) মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ হচ্ছে। প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেছিলাম। কী-ই বা বয়স তখন আমার। সমাজের ভাল করব সমাজকে বদলাব এই সদিচ্ছা নিয়েই আন্দোলনে এসেছিলাম। বিপ্লব সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা—কিছুটা শুনে, কিছুটা পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে এক বিশাল প্রত্যাশা। সেই সময় যে দুই কমিউনিস্ট পার্টিকে দেখেছি—সেই দুটি আমার চিন্তায় প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ। তাই সি. পি. আই. (এম-এল)-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। এই আনুগত্যের জন্যই মূর্তি ভাঙার কাজকে সমর্থন করলাম। কিন্তু মনে যে প্রশ্ন ছিল না তা নয়। ওখানে বসেই ভাবলাম মানুষজন আমাদের কাজকে ঠিকমতো নেবে তো? গোপনে পার্টির যে কাগজপত্র দেখলাম, তাতে ছেলেদের কাজকে সমর্থন জানানো হয়েছে। পার্টি নেতৃত্বের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। সেই নেতৃত্ব যখন সমর্থন জানাচ্ছে তাহলে এই কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আর কোনো সংশয় রইল না।

আর কোনো মূর্তি ভাঙার সময় মন চঞ্চল হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেলায় স্বাভাবিক ভাবেই মনে হল এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? তখন পার্টির কাগজেই মূল্যায়ন দেখতে পেলাম। একটা ব্যাখ্যা পেলাম : উনি সংস্কৃত কলেজে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আসলে এটা একটা ব্যাখ্যা মাত্র। সেই অল্পবয়সে এটা মেনে নিয়ে সমর্থন জানালেও পরবর্তীতে বারবার মনে হয়েছে আমাদের অন্যায় না হলেও খুব ভুল হয়ে গেছে। পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্যই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক কথাগুলো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও বলতে ভয় পেয়েছি। যে পার্টি সাধারণ মানুষের মঙ্গল করবে, যে পার্টির জন্য জেলজীবন, যে পার্টির জন্য আমার পাশের বন্ধুরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল তাকে চ্যালেঞ্জ জানাব এমন সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি।

আজ যেমন অনায়াসেই বলতে পারি একটা মানুষকে তাঁর সময়ের নিরিখেই বিচার করতে হয়। ১৯৭০-এ বসে বিদ্যাসাগরের সময়টাকে বুঝতে হবে। বিদ্যাসাগরের সময়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট আধুনিকমনা ছিলেন। আমরা তাঁর অন্যান্য কাজকে না দেখে একটা কাজই দেখেছিলাম। এবং তাতেই তাঁকে ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের দালাল বললাম। এই কলঙ্ক লেপনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মুখেই কলঙ্ক লেপন করা হল বলে আমার মনে হয়। এই ব্যাপারটা আমরা আরও যাঁদের মূর্তি ভেঙেছি সেইসব মনীষীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

আর একটা কথা আমার মনে হয়। সাধারণ মানুষের চিন্তাকে উন্নত না করে যে কোনো

সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভুল। কোনো মানুষ যদি সাধারণ মানুষের বিরোধীও হয় অর্থাৎ যার মূর্তি সত্যিই ভাঙা উচিত সেক্ষেত্রেও জনগণকে সচেতন করা দরকার।
এই কাজ না করার ফলে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা আমরা তাদের বিরক্তির কারণ হয়েছি।
এসব সত্ত্বেও বলব এই মূর্তি ভাঙার রাজনীতি আমাদের অনেক অজানা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। পুরনো অনেক কিছুকে যাচাই করতে শিখিয়েছিল। যা কোনোদিন আলোচিত হয়নি এইরকম অনেক অজানা তথ্যকে সমাজের কাছে হাজির করতে পেরেছিলাম।

প্রদীপ ধর

নিজেদের মাথা-কাটা

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে একদঙ্গল তরতাজা ছেলেমেয়ে পথ খুঁজতে ঘর ছেড়েছিল। সাহস আর সদিচ্ছাটুকুই ছিল তাদের পাথেয়। সমাজকে বদলানোর জন্যই এই খোঁজা।
যেভাবে সমাজজীবন চলছে সেভাবে চলতে পারে না। পালটাতে হবে সবকিছু। কিন্তু কীভাবে? খুঁজতে-খুঁজতে একদিন হদিশ মিলবেই।
ঠিক এইরকম সময়েই কানে এসে পৌঁছল চীনের সাংস্কৃতিক-বিপ্লবের কথা। এই তো পাওয়া গেছে পথ। 'চীনের পথই আমাদের পথ'। সাংস্কৃতিক-বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের তাৎপর্যকে অনুধাবন না করে কয়েকটা কথা বা স্লোগানকে মূলমন্ত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়া হল। 'পুরনোকে না ভাঙলে নতুনকে জানা যাবে না'।
নতুন করে ভাবনা শুরু হল। এতকাল এই সমাজ আমাদের সামনে যে ইমেজ তৈরি করে এসেছে—সেই ইমেজ জনগণের পক্ষে নয়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা রেনেশাঁ। যেটা ছিল বাঙলারই রেনেশাঁ। কিন্তু সেই জাগরণ কাদের জাগরণ? একে কি মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণ বললে ভুল বলা হবে? সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বৌদ্ধিক মুক্তি চাই আমরা। ওই জাগরণ হাশেম শেখ বা রামা কৈবর্তের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এমনকি কয়েকশো বছর ধরে পাশাপাশি থাকা মুসলিম সম্প্রদায়কে শামিল করতে পারেনি। আমরা ইতি-নেতি সব এক করে ফেললাম। আর এই একাকারের মধ্য দিয়ে 'কত মূর্তির মাথা পড়ল কাটা' আর আজ এটা ভাবলে আমাদের মাথা-কাটা।
কুশপুত্তলিকা দাহ আর মূর্তিভাঙার চিন্তার মধ্যে অনেক তফাত। কয়েকদিনের একটা আন্দোলন বা সাময়িক বিক্ষোভ থেকে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় এবং এই ব্যাপারটা